করোনা সংকট কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিপূজা আরো ছড়ানোর প্রচেষ্টা

রামচন্দ্র গুহ

" ....২০১৪ সালের মে মাস থেকে শুরু করে ২০২০ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত আমি এই বিশ্বাসে ছিলাম যে, এতগুলি প্রধান রাজ্য কেন্দ্রের শাসকদলের ক্ষমতাবৃত্তের বাইরে রয়েছে যখন, তখন নিশ্চয়ই জুন, ১৯৭৫ এবং মার্চ, ১৯৭৭ এর মধ্যবর্তী সময়ে ভারত যে তীব্র মাত্রার একনায়কতন্ত্রী শাসন প্রত্যক্ষ করেছে, সেরকমটা এবার আর হবে না। কিন্তু এই ক্ষীণ আশার আলো জেগে থাকা মনের গভীরেও ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা বিশাল আশঙ্কায় ভুগছি আমি। সাম্প্রতিক মহামারি মোদির হাতে তুলে দিয়েছে সেই অতি দুর্লভ সুযোগ, যাকে কাজে লাগিয়ে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে হতদুর্বল করে ফেলার আগ্রাসী প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই এই প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেওয়া চলবে না। সর্বশক্তি দিয়ে রাজ্যগুলিকেই এই প্রচেষ্টা প্রতিহত করতে হবে। জরুরি অবস্থার অভিজ্ঞতা যদি আমাদের কিছুমাত্র শিক্ষা দিয়ে থাকে, তা হল এই যে বিভিন্নতায় ও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এই মহান দেশের উপর এক দল, এক আদর্শ এবং এক নেতাকে তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ভার চাপিয়ে দেওয়া কোনোভাবেই দেওয়া যায় না। "

সাম্প্রতিককালে ইন্দিরা গান্ধী এবং নরেন্দ্র মোদির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে তুলনা টানা হয়। রাজনীতির জগতে এই দুই ব্যক্তিত্বের বেড়ে ওঠা এবং তাঁদের আদর্শগত অবস্থানের নির্মাণ বিচার করলে দু'জনকে পাওয়া যায় দুই বিপরীত মেরুতে। একজনের বেড়ে ওঠা সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর একেবারে উঁচুতলায়, অপরজন খুবই সাধারণ অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছেন। একজনের জীবনে প্রবল প্রভাব তাঁর পিতার, যিনি আজীবন আর এস এসের বিপরীত মতাদর্শে বিশ্বাস করে গেছেন; অপরজনের নির্মাণ কট্টর আর এস এস পরিমণ্ডলে। একজন অন্য কাজের পাশাপাশি সন্তান সন্ততি নিয়ে পরিবার পালন করেছেন, অন্যজন পরিবার ত্যাগ করে এসেছেন। একজন জন্মসূত্রে সরাসরি রাজনীতির উচ্চপদে আসীন হতে পেরেছেন, অন্যজনকে একেবারে নিচুতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উপরে উঠতে হয়েছে।

বৈপরীত্যটুকু সরিয়ে রাখলে দু'জনের রাজনৈতিক শৈলীতে আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য দেখা যায়। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি দ্য হিন্দু পত্রিকায় লিখেছিলাম, "শ্রীযুক্ত মোদির গুণমুগ্ধ অথবা তাঁর সমালোচক, কেউই আমার সঙ্গে একমত না হতে পারেন, কিন্তু সত্যটা হল এই যে, অতীত ও বর্তমানের সকল রাজনীতিবিদের মধ্যে বিচার করলে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী (নরেন্দ্র মোদি) সেই ১৯৭১-৭৭ সালের ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য রাখেন। শ্রীমতী গান্ধী যেমনটা করেছিলেন, ঠিক সেভাবে শ্রীযুক্ত মোদি তাঁর দল, তাঁর সরকার, তাঁর প্রশাসন ও তাঁর দেশকে তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বের ছায়া হিসাবে গড়ে তুলতে চান"। ঐ নিবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়েছিল, তখন শ্রীযুক্ত মোদি জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে প্রবেশ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করে ফেলেছেন। এর পনেরো মাস পর তাঁর নেতৃত্বে বি জে পি দল লোকসভায় পরিষ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হন। ১৯৮৪ সালের পর থেকে প্রথমবারের মতো কোনো দল লোকসভায় স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। প্রথম কয়েকমাসের মধ্যেই নরেন্দ্র মোদি এমন কিছু পদক্ষেপ করলেন, যাতে তাঁর সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য আরো ভালোভাবে প্রকাশ পেল। শ্রীমতী গান্ধী যেমনটি করেছিলেন, ঠিক সেইভাবে মোদি প্রথমেই দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতার ডানা ছাঁটলেন, সংবাদ মাধ্যমকে আনুগত্যে বাধ্য করলেন এবং প্রশাসন, কূটনীতিবিদ ও তদন্ত সংস্থাগুলিকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে শুরু করলেন। এসব কিছুর মূল লক্ষ্য ছিল একটাই— ব্যক্তির ছায়াকে দীর্ঘতর করে করে সর্বগ্রাসী করে তোলা।

নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হবার কয়েক মাসের মধ্যেই অন্য অনেক পর্যবেক্ষকও তাঁর সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর তুলনা করতে শুরু করলেন। আলোচনায় উঠে আসতে লাগল 'অঘোষিত জরুরি অবস্থা', 'সন্তর্পণে বাড়তে থাকা ফ্যাসিজম' ইত্যাদি শব্দবন্ধ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চাইছেন, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। তবে আমার ভিতরে থাকা ইতিহাসবিদ সত্ত্বা আমাকে বারবার আশ্বস্ত করে বলত, ১৯৭৫ এর ভারত আর ২০১৪ সালের ভারত এক নয়। ইন্দিরা গান্ধী যখন জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন, তখন কেন্দ্রে কংগ্রেস দলের সরকার তো ছিলই, পাশাপাশি দেশের প্রধান রাজ্যগুলির মধ্যে এক তামিলনাড়ু ছাড়া অন্য সব রাজ্যে ছিল কংগ্রেসের সরকার, হয় এককভাবে নয়তো জোটের শরিক হিসাবে। অপরদিকে নরেন্দ্র মোদি যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন, তখন দেশের অনেকগুলি রাজ্যেই বি জে পি ক্ষমতার বাইরে। আর সেজন্যেই আমি ভাবতাম, আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তার অন্তর্নিহিত শক্তি দিয়ে স্বৈরতন্ত্রের বিকাশকে প্রতিহত করতে সক্ষম হবে। নরেন্দ্র মোদির প্রথম দফার প্রধানমন্ত্রিত্বে বিজেপি বেশ কিছু প্রধান রাজ্যে ক্ষমতা দখল করতে পারলেও অন্য কিছু প্রধান রাজ্যের নির্বাচনে হেরে যায়। এমনকি ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে মোদিও তাঁর বিজেপি বিশাল বিজয় হাসিল করতে পারলেও রাজ্য বিধানসভায় তীব্র লড়াইয়ের মুখে পড়ে যায়। মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ড বিধানসভার নির্বাচনে যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

এরপর সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বা সি এ এ-র বিরোধিতায় দেশজুড়ে যে বিশাল আন্দোলন গড়ে ওঠে, তাকেও ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তথা গণতন্ত্রের শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে, ফলে আশায় বুক বাঁধার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। এই দানবীয় আইন, যা সংবিধানের মূল ভাবনার উল্লঙ্ঘনকারী বলেই প্রতিভাত, এর বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজের বৃহদংশ সোচ্চার হয়ে ওঠে। অনেকগুলি বৃহৎ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি এই আইনের বিরোধিতা করেন। এই ঘটনাক্রম থেকে উপলব্ধি হয় যে, আগের সেই দিন এখন আর নেই। ইন্দিরা গান্ধি ঐ সময়ে যা করতে পেরেছিলেন, তার কারণ তখন কেন্দ্র ছাড়াও দেশের সবগুলি রাজ্যের ক্ষমতাই কংগ্রেস দলের করায়ত্ত ছিল (জরুরি অবস্থা জারি করার কয়েক মাসের মধ্যেই তামিলনাড়ুর ডি এম কে সরকারকে খারিজ করে দেওয়া হয়)।

তবে সাম্প্রতিককালের কোভিড-১৯ মহামারির ঘটনা পরিস্থিতিকে পুরো পাল্টে দিয়েছে। এই মহামারি নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর সরকারের হাতে দুর্লভ সুযোগ এনে দিয়েছে, যা ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে আরো দুর্বল করে দিয়ে রাজ্যের তুলনায় কেন্দ্রকে আরো অনেক বেশি শক্তিশালী করে তুলতে চাইছে এই সরকার। এই লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই করা হয়ে গিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে —

১। জি এস টি বাবদ আদায়ীকৃত করের যে অংশ রাজ্যের ন্যায্য পাওনা, তা আরো বহু দিনের জন্য রাজ্যের কাছে হস্তান্তর না করে আটকে রাখা। এভাবে আটকে রাখা অর্থের পরিমাণ কিন্তু বিশাল, সর্বমোট ৩০,০০০ কোটি টাকারও বেশি। এই অর্থ যদি রাজ্যের কাছে হস্তান্তর করা হয়, তবে জনদুর্ভোগ অনেকাংশে লাঘব করা সম্ভব

হয়।

২। 'পি এম কেয়ার্স' নামে নতুন এক তহবিল গঠন করা। লক্ষণীয়, এই তহবিলে যারা অর্থ প্রদান করবেন, তাদের জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন কোম্পানিগুলির দান সেই কোম্পানির 'সামাজিক দায়বদ্ধতা' বা কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সি এস আর) খাতে খরচ হিসাবে দেখানো যাবে। কিন্তু যাঁরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করবেন, তাঁরা এমন কোনো ছাড় বা সুবিধা পাবেন না। এই বিশাল তহবিলের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নিজে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে রইলেন। অন্যদিকে এই তহবিলের অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি বেশ গোপনীয়তায় মোড়া, কারণ দেশের সর্বোচ্চ হিসাব নিরীক্ষক অর্থাৎ কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সি এ জি) পর্যন্ত এই তহবিলের হিসাব পরীক্ষা করতে পারবেন না।

৩। সাংসদ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (MPLADS) রদ করা। অশালীন কেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে এও এক নগ্ন পদক্ষেপ, কারণ এখন সংসদ সদস্যরাও নিজ নির্বাচন ক্ষেত্রের জনদুর্ভোগ নিরসনে কোনো অর্থ বরাদ্দ করতে পারবেন না।

৪। অবিজেপি রাজ্য সরকারদের বিশৃঙ্খলায় ফেলার জন্য ঐসব রাজ্যের রাজ্যপালদের দলানুগত আচরণ। লক্ষণীয় মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকে রাজ্যের বিধান পরিষদে মনোনয়ন করার প্রস্তাব পাওয়ার পরেও ঐ রাজ্যের রাজ্যপাল বহুদিন ধরে চুপচাপ বসে থাকেন। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল যেভাবে তাঁর নিজের সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সরব হয়েছেন, তাও নজিরবিহীন ("আমি বুঝতে পারছি, পশ্চিমবঙ্গে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ আটকানোর ক্ষেত্রে আপনার যে শোচনীয় ব্যর্থতা, তা থেকে মানুষের দৃষ্টি সরানোর লক্ষ্যেই আপনার পুরো রণকৌশল। তাছাড়াও সংখ্যালঘু তোষণে আপনার পদক্ষেপগুলি এত উদ্ভট ও প্রকট ....."ইত্যাদি)। এই রাজ্যপালেরা নিজের থেকে এইরকম অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ করছেন, তা তো হয় না। বরং যে যে রাজ্যে বিজেপি দল ক্ষমতার বাইরে রয়েছে, সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতেই রাজ্যপালদের এমন আচরণ, এমনটা হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।

এই তালিকা কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে মাত্র, সম্পূর্ণ তালিকা নয় এটি। তবে এই দৃষ্টান্তমূলক তালিকা থেকে যেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল, রাজ্যগুলিকে নতজানু করিয়ে রাখাই কেন্দ্রের লাগাতার চেষ্টায় রয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির ঘটনাকে ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে দুর্বলতর করার এই শীতলমস্তিষ্ক প্রচেষ্টার পাশাপাশি আরেকটি বিষয়ও লক্ষণীয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামে ব্যক্তিপূজাকে আরো বেশি প্রশস্ত করে তোলা হচ্ছে। দূরদর্শন, বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, বিজেপি-র আইটি সেল এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বরিষ্ঠ সদস্যরা সবাই মিলে একযোগে উদয়াস্ত একটাই সুর বাজিয়ে বলেছেন — শুধু মোদিই পারেন ভারতকে রক্ষা করতে।

আমি ২০০২ সালের আগে ও পরে গুজরাট সফর করেছি। নরেন্দ্র মোদির রাজনৈতিক শৈলী নিয়ে আমার কোনো দৃষ্টিবিভ্রম নেই। আমি ভালো করেই জানি, বৈচিত্র্যে ও বিভিন্নতায় পরিপূর্ণ এই দেশ ঠিক যে রকমের বহুত্ববাদী, অমায়িক, মিলন অনুঘটক এবং উদারমনোভাবাপন্ন রাষ্ট্রনেতা দাবি করে, নরেন্দ্র মোদি মোটেই এমনটা নন। তিনি তাঁর দল, তাঁর মন্ত্রিসভা, তাঁর আধিকারিক এবং তাঁর রাষ্ট্রের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ফলাতে বিশ্বাসী। সেজন্যেই আমি ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আরেক সহজাত স্বৈরশাসক ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর তুলনা করেছিলাম। কিন্তু এরপরও আমি বিশ্বাস করেছিলাম, মোদি প্রধানমন্ত্রী হবার সময়ে দেশ যেরকম ছিল, তাতে তাঁর অতিকর্তৃত্ববাদী ও কেন্দ্রীকরণমুখী আচরণ কিছুটা হলেও বাধাপ্রাপ্ত হবে।

আমি ১৯৭৫-এর জরুরী অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি এবং তার উপর গবেষণাও করেছি। সেই অভিজ্ঞতার সুবাদে ২০১৪ সালের মে মাস থেকে শুরু করে ২০২০ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত আমি এই বিশ্বাসে ছিলাম যে, এতগুলি প্রধান রাজ্য কেন্দ্রের শাসকদলের ক্ষমতাবৃত্তের বাইরে রয়েছে যখন, তখন নিশ্চয়ই জুন, ১৯৭৫ এবং মার্চ, ১৯৭৭ এর মধ্যবর্তী সময়ে ভারত যে তীব্র মাত্রার একনায়কতন্ত্রী শাসন প্রত্যক্ষ করেছে, সেরকমটা এবার আর হবে না। কিন্তু এই ক্ষীণ আশার আলো জেগে থাকা মনের গভীরেও ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা বিশাল আশঙ্কায় ভুগছি আমি। সাম্প্রতিক মহামারি মোদির হাতে তুলে দিয়েছে সেই অতি দুর্লভ সুযোগ, যাকে কাজে লাগিয়ে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে হতদুর্বল করে ফেলার আগ্রাসী প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই এই প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেওয়া চলবে না। সর্বশক্তি দিয়ে রাজ্যগুলিকেই এই প্রচেষ্টা প্রতিহত করতে হবে। জরুরি অবস্থার অভিজ্ঞতা যদি আমাদের কিছুমাত্র শিক্ষা দিয়ে থাকে, তা হল এই যে বিভিন্নতায় ও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এই মহান দেশের উপর এক দল, এক আদর্শ এবং এক নেতাকে তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ভার চাপিয়ে দেওয়া কোনোভাবেই দেওয়া যায় না।

(লেখক ঃ বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও লেখক)

সৌজন্য ঃ নিউজ পোর্টাল এনডিটিভি ডট কম ঃ ৩০ এপ্রিল, ২০২০